Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ তাছলিমা খাতুন

রোলঃ 216020535

১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: তাছলিমা খাতুন

রোলঃ 216020535

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ইসলামে নারীর মর্যাদা” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান শিমু, আইডিঃ 216020535 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামে নারীর মর্যাদা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

মোছা: তাছলিমা খাতুন

আইডিঃ 216020535

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা 5

জাহেলী যুগে নারীর অবস্থান ও ইসলামে নারীর মর্যাদা..7

জাহেলিয়াত যুগের বিবাহ 7

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী..11

ইহুদিজাতি ও খৃস্টধর্মে 12

ইসলামে নারীর মর্যাদা 14

ইলমের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার 21

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য দিয়েছেন অসংখ্য অগণিত আর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, তার পরিবারবর্গ ও তার সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দের উপর আল্লাহতালা মানুষকে নারী-পুরুষ দুই শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন।এরা যাতে একে অপরের সম্প্রক হয় এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ঠিক রাত দিনের মতো আল্লাহ তা'আলা নারীকে যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যে শোভিত করেছেন, তার তার অন্যতম হলো আচার-আচরণে আহ্লাদের প্রাচুর্য ও আবেগে বাহুল্য।তেমনি গঠন প্রকৃতিতে ও নারীর কোমলতা ও এমন নম্রতায় সম উজ্জ্বল যা পুরুষের সঙ্গে বসবাসরত পরিবেশে তার স্বাধীনতাকে করে সীমাবদ্ধ। আল্লাহুতালা নারীদের স্বভাব চরিত্র বানিয়েছেন কোমল।যাতে সে শুষে নিতে পারে পুরুষের যাবতীয় রুক্ষতা। কেড়ে নিতে পারে তা হৃদয় অন্তর। নারীর সান্নিধ্য পুরুষকে দেয় মানুষিক আশ্রয়। যেখানে এলে তার চিন্তা, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা লঘু হয়ে যায়। কেটে যায় সব ক্লান্তি ও বিষাধ। একইভাবে সে যাতে হয় মমতাময়ী ও শিশুর লালন পালনের উপযুক্ত।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রমাণ করেছে নারীই সবচেয়ে বেশি কঠিন মানুষিক চাপ বহন করতে সক্ষম। মানসিক আঘাত সারাতে নারী রাখতে পারে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা।

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন রুঢ়তা ও কঠোরতা দিয়ে। এ কারণে সে অনেক দুর্ঘটনার সামনে অবিচল থাকতে পারে।নারীর তুলনায় বেশি নিরাপত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে ভীতিকর ঝুঁকিপূর্ণ ও বিবিসিকাময় পরিস্থিতিতে এগিয়ে যায়।

বর্তমানে নারীদের নিয়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছ অসংখ্য সংগঠন সংস্থা। এরা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা দ্বারা যদি একথা বুঝায় যে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিশ্চিত করা নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য না করা উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো পশ্চিমা নারীদের মতো তাদেরও অধিকার নিশ্চিত করা তাহলে আমরা বলতে বাধ্য পশ্চিমা নারী আজ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার উপায়

খুঁজছে। তাদের অশান্তি আত্মফলও এত চরমে যে তাদের দেশের নারীদের আত্মহত্যা করার প্রবণতা বাড়ছে তারা তাদের জীবনের প্রতি খুবই বিতৃষ্ণ।পশ্চিমাদেশের সচেতন নারীরা তাদের পশুত্বের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে পশ্চিমা দেশগুলোতে পুরুষের তুলনায় নারীদের ইসলাম গ্রহণের হার অধিক। কারণ তাদের দেশে তথাকথিত নারী স্বাধীনতা থাকলেও তাদের দেশে নারীর আসল মর্যাদা যে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মূলত আল্লাহ তাআলাই নারীদের জন্য তাদের প্রকৃত সম্মান মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছেন।আমরা গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে নারী ও পুরুষ কখনোই সকল বিষয়ের সমান হতে পারে না

জাহেলী যুগে নারীর অবস্থান ও ইসলামে নারীর মর্যাদা

জাহেলি যুগের আরব লোকেরা কন্যা সন্তান জন্মদান কে নিজেদের জন্য অসম্মানজনক মনে করত,ভাই তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করে ফেলত।জাহেলি যুগে নারীর অধিকার বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। প্রতিনিয়তই তাদের ইজ্জত ও সম্মান লুণ্ঠিত হতো এবং তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হত।নারীদেরকে তাদের উত্তাধিকার সম্পদ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হতো। তাদেরকে সাধারণত কোন সম্পদের মালিক করা হতো না যার কারণে জাহেলিয়াতের নারীদের মালিকানা বলতে কিছুই ছিল না। ইসলাম আগুনে পর ইসলাম নারীদের জন্য উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করে এবং সম্পত্তির তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে জাহেলিয়াতের যুগের স্বামী তারা অথবা মৃত্যুর পর তার পছন্দ অনুযায়ী অপর কোন পুরুষের নিকট বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নারীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।আল্লাহ তাআলা বলেন এখন তোমরা কি স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছাবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না যে তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয় এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস আছে এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও পথিক পবিত্র আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না সূরা বাকারা আয়াত ২৩২

জাহেলিয়াত যুগের বিবাহ

জাহিলিয়ার যুগে যারা সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবারে অন্তর্ভুক্ত নয় বরং বড় মধ্যম শ্রেণীর লোক তাদের মধ্যে নারীদের সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল যারা আলোচনা করতে গিয়ে আম্মাজান হযরত আয়েশা রাঃ বলেন জাহেলিয়াতের যুগে বিবাহ ছিল চার প্রকার যেভাবে বিবাহ করে কোন ব্যক্তি কারো অভিভাবকের নিকট তার অভিভাবকদের অধীন কোন মেয়েকে অথবা সে অভিভাবকের নিকট তার মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব করতো তারপর সে রাজি হলে তাকে মোহরানা দিয়ে বিবাহ করে

তুই স্ত্রীকে বলতো তুমি তোমার অপবিত্রতা হতে পবিত্র হলে অমুকের নিকটে গিয়ে তার কাছ থেকে তুমি উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তারপর তার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখত এবং যতদিন পর্যন্ত ওই লোকটার সাথে যৌনাচারের লিপ্ত হয়েছিল তার থেকে গর্ভধারণ না করা পর্যন্ত সে তাকে স্পর্শ করতো না আর যখন সে গর্ভধারণ করত তখন চাইলে সে তার সাথে সংসার করতো অথবা ইচ্ছা করলে সে না নাও করতে পারত আর তাদের এধরনের অনৈতিক কাজ করার উদ্দেশ্য হলো যাতে তাদের গর্ভে যে সন্তান আসবে তা মোটা তাজা ওষুধ খানদের অধিকারী হয় বিবাহকে বলা হবে।

তিন ১০ জনের চেয়ে কম সংখ্যক লোক একত্র হতো তারা সকলেই বালাক্রমে একজন মহিলার সাথে সঙ্গম করতো যে তাদের থেকে গর্ভধারণ করার পর যখন সন্তান প্রসব কর এবং কয়েকদিন অতিবাহিত হতো তখন সে প্রতিটি লোকের নেটওয়ার্ক তার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর পাঠাতো নিয়ম হলো সে যাদের নিকট সংবাদ পাঠাতো কেউ তা অস্বীকার করতে পারতো না ফলে তারা সকলের সামনে একত্র হত তখন সে তাদের বলতো তোমরা অবশ্যই তোমাদের বিষয়ে অবগত আছো আমি এখন সন্তান প্রসব করেছি এর দায়িত্ব তোমাদের যেকোনো একজনকে নিতে হবে তারপর সে যাকে পছন্দ করত তার নাম ধরে তাকে বলতো এটি তোমার সন্তান এভাবে সে তার সন্তানকে তাদের একজনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিত লোকটি তাকে কোনভাবেই নিষেধ করতে পারত না।

চার,অনেক মানুষ কোন একই মহিলার সাথে যৌনকর্মে মিলিত খুব যে কথার বিশ্বাস সে কাউকে নিষেধ করবে না এবং বাধা দিত না ব্যভিচারী মহিলা তারা বাড়ির দরজার নিদর্শন স্থা স্থাপন করতো পেপার তো যে এখানে কোন যৌনাচারী মহিলা আছে এভাবেই চলতেছিল আরবদের সামাজিক অবস্থা ও তাদের নারীদের করণ পরিণতি

আল্লাহ তাআলা বলেন আর যাদের বিভাগ সমর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে আর তোমাদের মালিকাদির

দাসদের মধ্যে চড়া মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাই লিখিত চুক্তি কর তোমার আদর করলাম আছে বলে জানতে পারো এবং এদের সম্পদ দিয়েছেন না থেকে তোমরা তাদেরকে দাও তোমাদের তার দাসীদের আমাদের দাসীরা সুদীপ্ত রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থক জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচার এ বাধ্য করোনা আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। সূরা নূর আয়াত ৩৩

ছোটবেলায় কন্যা সন্তান হিসাবে, কৈশোরে বোন হিসাবে যুবতী হলে স্ত্রী হিসাবে এবং পৌঁছালে মূল্যায়ন করল এবং তাদের উচ্চ মর্যাদা আসনে অধিষ্ঠিত করল।

আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন-

পৃথিবীতে আমি খলীফাহ বানাতে চাই। (সূরা বাকারা (২) : ৩০)

তখন প্রকৃতপক্ষে সেটা শুধু একজন পুরুষ (বা হযরত আদম আ.)কে সৃষ্টি করার ঘোষণা ছিলো না, বরং নর ও নারী সম্মিলিতরূপে যে 'মানব' সেই মানব সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। অর্থাৎ সেটা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া উভয়ের সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। কারণ পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ও খেলাফত শুধু পুরুষ দ্বারা সম্ভব ছিলো না। আদমের খেলাফতে হযরত হাওয়ার ভূমিকা ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য। জান্নাতে আমাদের বাবা হযরত আদম (আ.)কে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন নিজের মধ্যে তিনি একটি শূন্যতা, একটি অভাব এবং অশান্তি অনুভব করছিলেন। তিনি যখন ঘুমুলেন তখন তাঁর বামপার্শ্বের অস্থির ঊর্ধ্ব-অংশ থেকে প্রথম নারী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো। কেন? আদম যেন তাঁর সঙ্গ দ্বারা সুখ-শান্তি এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করেন। বস্তুত পৃথিবীর প্রথম নারী ছিলেন প্রথম পুরুষের জন্য স্রষ্টার পক্ষ হতে জান্নাতের চেয়েও মূল্যবান উপহার। কারণ জান্নাত তার অফুরন্ত নায-নেয়ামত সত্ত্বেও আদমের অন্তরের শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা, অভাব ও অশান্তি দূর করতে পারেনি। একা একা জান্নাত

ভোগ করে আদমের অন্তরে শান্তি আসেনি। হযরত হাওয়াকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাওয়ার পরই আদমের কাছে জান্নাত জান্নাত মনে হয়েছিলো। জান্নাতের বাগানে দু'জনের এই যে শান্তির সম্পর্ক, এটা শুধু ঐ দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উভয়ের সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রেও সমান সত্য। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি 'নফস' থেকে এবং বানিয়েছেন তার থেকে তার জোড়া যেন সে তার কাছে স্বস্তি লাভ করে। (সূরা আরাফ : ১৮৯)

সুতরাং বোঝা গেলো, পৃথিবীর প্রতিটি স্ত্রী তার স্বামীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। এজন্যই আল্লাহর নামকে মাধ্যম করে এবং মোহর আদায় করে একটি জান্নাতি উপহাররূপেই নারীকে গ্রহণ করতে হয়। আর এজন্যই বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মুহূর্তে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

আর তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানতরূপে, আর তোমরা তাদের 'লজ্জাস্থান'কে হালাল করেছো আল্লাহর কালিমাকে মাধ্যম করে।' (সহীহ বুখারী ১/৩৯৭)

তো উপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো-

(ক) ফিরেশতাদের সভায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খেলাফতের যে ঘোষণা, প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো নর ও নারীর সম্মিলিত যে 'মানবরূপ' সেই মানবসৃষ্টির ঘোষণা। (তাতে হযরত আদম আ.-এর ভূমিকা অবশ্যই প্রধান, তবে হযরত হওয়া আ.-এর ভূমিকাও ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য।)

(খ) নারী হচ্ছে নরের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করা।

(গ) পুরুষের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করা এবং নারীর জীবনে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা। কারণ কোন নারী যদি তার পরিবারে লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হয়; তার জীবনে যদি অশান্তি থাকে তাহলে সে পুরুষের জন্য সুখ-শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম কিছুতেই হতে পারবে না।

হযরত আদম আ. যত দিন জান্নাতে ছিলেন, তারপর যতদিন দুনিয়াতে জীবনযাপন করেছেন মা হাওয়াকে তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনীরূপে প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে দান করেছেন এবং সর্বদিক থেকে তাঁর সুখ-শান্তি নিশ্চিত করেছেন। ফলে তিনি নিজেও মা হাওয়ার সঙ্গে থেকে সুখ-শান্তি লাভ করেছেন।

হযরত আদম (আ.)-এর ইনতিকালের পর মানবজাতি যত দিন তাদের পিতার তরীকার উপর ছিলো এবং নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করেছিলো তত দিন তারা সুখে শান্তিতেই জীবন যাপন করেছে। নারীর কাছে সে সুকূন ও স্বস্তি পেয়েছে।

কিন্তু একটা সময় এলো যখন মানুষ আল্লাহর বিধান ও শরীআত ভুলে গেলো এবং শয়তানের প্ররোচনায় হিদায়াত ও সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট হলো তখন অন্যান্য অনাচারের সঙ্গে নারীজাতির উপরও নেমে এলো বিভিন্ন অনাচার-অবিচার। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় নারীজাতিকে কী কী দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে এখানে আমরা সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী

গ্রীক ও রোমান সমাজে নারীকে মনে করা হতো সকল অনিষ্টের মূল এবং সবচে' নিকৃষ্ট প্রাণী। পরিবারে মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা কোন নারীর মর্যাদাই দাসীর চেয়ে বেশী ছিলো না। নারী ছিলো বাজারে বেচা-কেনার পণ্য। পরিবার-প্রধান যে কোন নারীকে বাজারে বিক্রি করতে পারতো।

কারণ আইনগতভাবেই নারী ছিলো পরিবারের অস্থাবর সম্পত্তি।

কোন পর্যায়েই নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিলো না। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী তার সম্পত্তি ভোগ করতে পারতো না এবং হস্তান্তরও করতে পারতো না।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা অধিকার ছিলো না। পরিবারের প্রধান পুরুষ যে স্বামী নির্বাচন করতো তাকেই গ্রহণ করতে নারী বাধ্য ছিলো।

প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া থাকে, এটাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান। সে হিসাবে গ্রীক ও রোমান উভয় সভ্যতারই শেষ দিকে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। নারীসমাজ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত উশৃঙ্খল হয়ে উঠলো এবং সমাজের সর্বত্র নগ্নতা ও যৌননৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়লো, যার অনিবার্য ফলরূপে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

তুরস্কের সুপ্রসিদ্ধ নারী বুদ্ধিজীবী খালিদা এদিব খানম গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় নারীর লাঞ্ছনা সম্পর্কে 'তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিশদ আলোচনা করেছেন।

ইহুদিজাতি ও খৃস্টধর্মে

নারীকে অভিশপ্ত মনে করা হয়, কারণ তাদের ধারণায় আদমকে ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান হাওয়াকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলো। উভয়জাতির বিশ্বাস ছিলো যে, স্ত্রীলোক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ তার মধ্যে মানবাত্মা নেই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ৫৮৬ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে এক ধর্মসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, স্ত্রীলোককে মানুষ বলা তো যায়, তবে তাকে শুধু পুরুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

খৃস্টধর্মের প্রভাবে নারীর প্রতি পাশ্চাত্যজগতের আচরণ ছিলো চরম অবমাননামূলক, যা মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এমনকি ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্বামীর অধিকার ছিলো স্ত্রীকে বিক্রি করার। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের পরও নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার কথা সেখানকার চিন্তানায়কদের মাথায় আসেনি। ১৯৩৮ সাল

পর্যন্ত ফরাসী নাগরিক আইনে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নারীর অধিকার ছিলো না কোন বিষয়ে কোন পক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার।

হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা ছিলো সবচে' করুণ। এ প্রসঙ্গে শুধু সতীদাহ-এর কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট, যা এই মাত্র সেদিন সংস্কারবাদী নেতা রাজা রামমোহন রায় ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে বাতিল করিয়েছেন।

আরব জাহিলিয়াতের সমাজেও আছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মর্মন্তুদ ইতিহাস। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কন্যাসন্তানের জন্মকে তখন মনে করা হতো চরম কলঙ্কের বিষয়। জাহেলি সমাজের এই চিত্রটি দেখুন আলকোরআনে-

(আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেয়া হতো তখন দুশ্চিন্তায় তার মুখ কালো হয়ে যেতো, আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। ঐ জঘন্য খবরের কারণে মানুষের কাছ থেকে সে মুখ লুকিয়ে ফিরতো। (আর দিশেহারা হয়ে ভাবতো যে কী করবে সে?) লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে। কত মন্দ ছিলো তাদের এ মনোভাব! (সূরা নাহল : ৫৮)

সেখানে নারীর জন্মগ্রহণই ছিলো অপরাধ, আর বেঁচে থাকা ছিলো আরো বড় অপরাধ। তাই অধিকাংশ সময় জন্মদাতা পিতা কন্যাসন্তানকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতো এবং নিজের হাতে জ্যান্ত দাফন করে ফেলতো। অসহায় মায়ের বাধা দেয়ার কোন অধিকার ছিলো না। তাই কন্যাসন্তান জন্ম দেয়ার আশঙ্কায় মা ভুলে যেতো তার প্রসববেদনা। অস্থির পেরেশান হয়ে শুধু ভাবতো পিতার নিষ্ঠুরতা থেকে কীভাবে সে বাঁচাবে তার সন্তানকে? কোথায় কীভাবে লুকাবে সে তার কলিজার টুকরোকে? কোরআনে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ ভাষায় এই নিষ্ঠুর প্রথার নিন্দা করে বলা হয়েছে-

আর যখন জ্যান্ত দাফনকৃত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো (তখন কী জবাব দেবে তোমরা?) (সূরা আত-তাকভীর : ৮ ও ৯)

তো এই ছিলো ইসলামের পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা ও মর্যাদাগত অবস্থান। এককথায় যদি বলি তাহলে বলতে হয়, মানুষ হিসাবে নারীর কোন মর্যাদাই ছিলো না। চরম লাঞ্ছনা ও যিল্লতি ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই ছিলো না।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

প্রথম কথা এই যে, মৌলিক মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

বিকৃত ইহুদিধর্ম ও খৃস্টধর্ম যেখানে আদমের বিচ্যুতির জন্য হাওয়াকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে ইসলাম সেখানে আদম ও হাওয়া দুজনকে ভুল ও ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ক্ষেত্রে অভিন্ন সাব্যস্ত করেছে। ইরাশাদ হয়েছে-

শয়তান উভয়কে তা থেকে বিচ্যুত করেছে। (সূরা বাকারা : ৩৬)

ভুল শোধরানো সম্পর্কে বলা হয়েছে-

তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। (সূরা আরাফ : ২৩)

তবে যেহেতু পরিচালক হিসাবে আদমের দায়িত্ব ছিলো বেশী সেহেতু এককভাবে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে-

সে ভুলে গিয়েছিল। আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। (সূরা ত্বহা : ১১৫)

নারী ও পুরুষের মৌলিকভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে-

এবং নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। তবে তাদের উপর পুরুষদের এক পর্যায়ের প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা : ২২৮)

এই এক পর্যায়ের প্রাধান্য হল, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধানের মর্যাদা, যা সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর এটি স্বামী-স্ত্রীর জীবন চলার পথে একটি অপরিহার্য বিষয়।

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

অর্থাৎ নারীরা হলো পুরুষের সমতুল্য। (সুনানে আবু দাউদ ১/৩১)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

যে ব্যক্তি কন্যসন্তানকে জ্যান্ত দাফন করবে না এবং তার অমর্যাদা করবে না এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫১০৩)

দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

আর যে কোন পুরুষ বা নারী নেক আমল করবে, আর সে মুমিন হবে, তাহলে তারা জান্নাতে দাখেল হবে এবং সেখানে তাদেরকে বেলা হিসাব রিযিক দান করা হবে। (সূরা মুমিন : ৪০)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন (আর বললেন) যে, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করবো না, সে পুরুষ হোক, বা নারী। তোমরা তো পরস্পরের অংশবিশেষ। (সূরা আলইমরান : ১৯৫)

নারীর সঙ্গে পুরুষের যতগুলো সম্পর্ক হতে পারে প্রতিটি সম্পর্ককে ইসলাম অনন্য মর্যাদা ও মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে নারীকে শুধু সমমর্যাদা নয়, বরং অগ্রমর্যাদা দান করেছে।

প্রথম সম্পর্ক হলো মা হিসাবে। তো ইসলাম ও তার নবীর কাছে মায়ের যে মর্যাদা তা পৃথিবীর কোন ধর্ম ও সভ্যতা এমনকি আধুনিক সভ্যতাও কল্পনা করতে পারেনি। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের আদেশ করেছি। (কারণ) তার মা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে।' (সূরা আহকাফ : ১৫)

এখানে পিতা-মাতা উভয়ের সঙ্গে সদাচার কেন করতে হবে তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে পিতার কোন অবদানের কথা বলা হয়নি, শুধু মায়ের ত্যাগ ও কষ্টের কথা বলা হয়েছে। অথচ পিতারও বিরাট অবদান রয়েছে সন্তানের জীবনে। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, মাতার ত্যাগ ও কষ্টের তুলনায় পিতার ত্যাগ ও কষ্ট খুবই সামান্য।

হাদীছ শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদাচারের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পর তোমার বাবা। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৭১)

আফসোস, যে ধর্মের নবী তাঁর উম্মতকে মাতৃজাতি সম্পর্কে এমন উপদেশ দান করেছেন সে ধর্মকে আজ নারী অধিকারের বিরোধীরূপে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। পক্ষান্তরে যেসকল ধর্ম ও সভ্যতার হাতে এবং যে আধুনিক

পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নারীজাতি বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছে তারা পেয়ে যাচ্ছে বেকসুর খালাস, বরং উলটো সেজে বসেছে নারীদরদী!

ফিরে আসি হাদীছের আলোচনায়। শুধু এই হাদীছই নয়, বরং অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক ছাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে গমন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছেন? ছাহাবী বললেন, আছেন। তখন তিনি বললেন, যাও তার কাছে বসে থাকো, কেননা জান্নাত তার পায়েরই কাছে। (মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৯; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১৩/৮০)

অন্য বর্ণনায় আছে, ‘জান্নাত হলো মায়েদের কদমের নীচে।’ (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৭৩৩০)

দ্বিতীয় সম্পর্ক হলো স্ত্রী হিসাবে। তো এ সম্পর্কে দেখুন, কোরআন শরীফে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ-

আর তোমরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসবাস করো সদাচারের সাথে। আর যদি (কোন কারণে) তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে হতে পারে যে, তোমরা এমন কোন কিছুকে অপছন্দ করলে, আর আল্লাহ তাতে প্রচুর কল্যাণ রেখে দিলেন। (সূরা নিসা : ১৯)

এ বিষয়টি হাদীছ শরীফে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন, ‘কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে যেন সম্পূর্ণ অপছন্দ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৯৭৯)

এখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের এমন একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যার উপর আমল করলে এখনই আমাদের সংসার ‘জান্নাত-নযীর’ হয়ে যেতে পারে।

দু’জন নারী-পুরুষ যখন একত্রে ঘর-সংসার করবে তখন একজনের সবকিছু অপরজনের ভালো লাগবে এটা হতেই পারে না। কিছু আচরণ ভালো লাগবে, কিছু মন্দ লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পুরুষের করণীয় হলো, স্ত্রীর ভালো গুণগুলোর দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহর শোকর আদায় করা যে, আলহামদু লিল্লাহ আমার স্ত্রীর মধ্যে এই এই ভালো গুণ তো আছে!

আল্লাহর শোকর আদায় করবে, আবার আন্তরিকভাবে স্ত্রীর প্রশংসা করবে। তখন হয়ত আল্লাহ তার মন্দ স্বভাবগুলো দূর করে দেবেন।

সুতরাং পুরুষের কর্তব্য হলো স্ত্রীর ত্রুটিগুলোর প্রতি ক্ষমাসুন্দর হওয়া, আর ভালো গুণগুলোর কদর করা। কারণ পূর্ণতা তো কোন মানুষেরই নেই। না নারীর, না পুরুষের।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و عاشروهن بالمعروف, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأ و يجعل الله فيه خيرا كثيرا

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই যে তার স্ত্রীদের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের জন্য সর্বোত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৪২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৬২)

উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ কেমন ছিলো তার বিশদ বিবরণ সীরাতের কিতাবে রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য তা পড়া এবং নিজেদের জীবনে তা আমলে আনা, যাতে প্রতিটি সংসার হতে পারে শান্তির জান্নাত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে কোন নারীকে প্রহার করেননি, বরং যখনই ঘরে প্রবেশ করতেন (তাঁর মনের

অবস্থা যেমনই হোক) পবিত্র মুখমন্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত থাকতো। তিনি নিজের কাজ নিজে করা পছন্দ করতেন, এমনকি ছেঁড়া জুতা নিজের হাতে সেলাই করতেন। (শামাইলে তিরমিযী; আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ)

বর্ণিত আছে, তিনি যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, ঘরের দরজা খুব আস্তে খুলতেন যাতে ঘরের লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুছল্লায় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন তখন ঘুমের অবস্থায় মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পা মুছল্লার উপর চলে আসতো। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাওয়ার সময় কোমলভাবে মা আয়েশা (রা.)-এর পা সরিয়ে তবে সিজদায় যেতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৫১২)

এজন্য কখনো বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না। সুবহানাল্লাহ!

একটি হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ করো। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৬৩)

কন্যা ও ভগ্নি হিসাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ শুনুন, যার খোলাছা হলো, কারো ঘরে যদি তিনজন বা দুজন কন্যা বা ভগ্নি থাকে, আর সে তাদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষা দান করে, তারপর তাদেরকে উত্তম পাত্রে বিবাহ দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) কোন কোন বর্ণনায় আছে, তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। কোন বর্ণনায় আছে, তাহলে সে আর আমি জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি থাকবো। তারপর তিনি দুই আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে ইশারা করলেন।তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা অন্তরঙ্গতা পোষণকারী মূল্যবান সম্পদ। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬)

যে কোন পরিবারে আপনি পিতা-মাতার প্রতি কন্যাসন্তানের অনুভব-অনুভূতি এবং সেই তুলনায় পুত্রসন্তানের অনুভব-অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, অবশ্যই আপনার বুঝে আসবে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন কন্যসন্তানদের সম্পর্কে একথা বলেছেন!

নারীদের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি

নারীসমাজের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি কেমন ছিলো এবং তাদের কষ্ট ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কত সজাগ ছিলেন এবং তাদের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি তাঁর কিরূপ আস্থা ছিলো তা নীচের বর্ণনাগুলো থেকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যাবে। তিনি ইরশাদ করেছেন-

তোমাদের দুনিয়াতে সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতের মধ্যে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২২৩৩)

এই হাদীছটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। কারণ সুগন্ধি ও নারীর একত্র উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বভাব ও ফিতরত এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে নারী সুগন্ধির মতই সিণগ্ধ ও পবিত্র। সুগন্ধি যেমন হৃদয়ে মস্তিষ্কে কোমল ও সিণগ্ধ অনুভূতি সৃষ্টি করে, নারীর সংস্পর্শও তেমনি কোমলতা, সিণগ্ধতা ও পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত এখানে পছন্দ করার কথা বলা হয়নি, বরং পছন্দ করানোর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ নবীর অন্তরে নারীর এই প্রিয়তা ও পছন্দনীয়তা নিছক মানবিক কোন আকর্ষণ নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ ঐশী বিষয়। আল্লাহ তা'আলার গায়বি ইশারা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ এটি যত না জৈবিক তার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। বলাবাহুল্য, এতে স্ত্রীজাতির আধ্যাত্মিক মর্যাদাও প্রকাশ পায়। অথচ ইসলামের পূর্বে নারীকে অপবিত্র সত্তা বলে সাব্যস্ত করেছে।

স্ত্রীজাতির সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কতটা সজাগ ছিলেন তা নীচের এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ঘটনার খোলাছা এই যে, একবার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মসজিদে নববীতে নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে কোন শিশুর কান্নার আওয়ায পেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে সালাম ফেরালেন, আর বললেন, আমি নামায সংক্ষিপ্ত করেছি, যাতে ঐ মা তার সন্তানের কারণে পেরেশান না হয়। (সহীহ বুখারী, সালাত অধ্যায়)

একসফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, আনজাশা নামে এক ছাহাবী উট দ্রুত হাঁকিয়ে নিচ্ছেন। ঐ উটের আরোহী ছিলো নারী। তখন তিনি ছাহাবীকে ধীরগতিতে ও কোমলভাবে উটচালনা করার আদেশ দিয়ে বললেন-

ধীরে হে আনজাশা! কাচের পাত্রগুলোর প্রতি কোমল হও। (বুখারী ও মুসলিম)

নারীকে কাচের পাত্রের সঙ্গে উপমা প্রদান করা কত যে প্রজ্ঞাপূর্ণ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই একটি উপমা দ্বারাই উম্মতকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি কত কোমল এবং তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে পুরুষকে কত সতর্ক, সাবধানী ও কোমল হতে হবে।

(এটা অবশ্য আলাদা বিষয় যে, মুসলিম নারীদের প্রতি মুসলিম পুরুষদের বর্তমান আচরণ কিরূপ? বর্তমানে কতজন মুসলমান এমন আছেন, যারা নবীর এই মহামূল্যবান উপদেশের প্রতি যত্নবান? ঘরে ও সফরে নারিদের সুখ-সুবিধার প্রতি তারা কী পরিমাণ খেয়াল রাখে? কী পরিমাণ কোমল আচরণ করে? আর কাল কেয়ামতের দিন তাদের নবীর কাছে তারা কী জবাব দেবে?)

ইলমের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার

ইসলামের পূর্বে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতা যেখানে নারীর শিক্ষার কোন অধিকারই স্বীকার করেনি। এমনকি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও এই সেদিন পর্যন্ত যেখানে নারীশিক্ষাকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো সেখানে ইসলাম সেই প্রথম দিন থেকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার সমান অধিকার ঘোষণা করেছে।

কারণ এটা তো বলাই বাহুল্য যে, দ্বীন ও শরীয়াতের উপর আমল করা পুরুষের জন্য যেমন ফরয তেমনি নারীর জন্যও ফরয। আর শরীয়তের ইলম অর্জন না করে শরীয়তের উপর আমল করা সম্ভব নয়। আর কোরআনের

হে আল্লাহ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। (সূরা ত্বহা : ১১৪)

এই প্রার্থনা তো পুরুষ ও নারী উভয়েই আল্লাহর কাছে করে থাকে। আর এটা শুধু জ্ঞান অর্জনের দু'আ নয়, বরং অধিক থেকে অধিক জ্ঞান অর্জনের দু'আ।

ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২২৪; তবরানী-আওসাত, হাদীস : ৯) এ হাদীছ ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া তলবে ইলমের যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই।

তাকে ইলম শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো, আর তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো। (সহীহ বুখারী)

এই হাদীছে স্বয়ং পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যেন তার তাদের অধীন নারীদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে, আর এর বিনময়রূপে জান্নাতের ঘোষণা এসেছে।

বর্ণিত আছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষেরা তো আপনার উপদেশ এককভাবে নিয়ে গেলো। সুতরাং আমাদের জন্য আপনার একটি দিন নির্ধারণ করে দিন যখন

শুধু আমরা আপনার কাছে আসবো। আপনি আমাদের ঐ ইলম থেকে শিক্ষা দান করবেন যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দান করেছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আবেদন গ্রহণ করে বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন একত্র হও। (সহীহ বুখারী, ইলম অধ্যায়)

এ হাদীছ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইলম অর্জনের জন্য নবীর কাছে যেমন নারীদের আলাদা সময় পাওয়ার হক ছিলো তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত ওয়ারিছীনে নবীর কাছেও সেটা পাওয়া তাদের হক।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহতুল মিমিনীনের লেখা শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন বলেও সীরাতের কিতাবে প্রমাণ রয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য স্ত্রীছাহাবী লিখতে জানতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে এবং সমকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা বোঝা যায় নিমেণাক্ত বর্ণনা থেকে।

হযরত ওরওয়া বিন যোবায়র তাঁর খালা সম্পর্কে বলেন, ফারায়েযের ইলম, হালাল-হারামের মাসায়েল এবং কোরআনের ইলমের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে বড় আলিম আমি দেখিনি। প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত মসরূক বলেন, আল্লাহর কসম, বড় বড় ছাহাবাকে আমি তাঁর কাছে মীরাছের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি।

হযরত ওরওয়া আরো বলেন,

সাহিত্য, কবিতা, চিকিৎসা এবং আরবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আমি দেখিনি।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তার মর্যাদা ছিলো অনেক পুরুষ সাহাবীরও উপরে।

জ্ঞানচর্চা ও তলবে ইলমের ক্ষেত্রে আরো বহু স্ত্রীছাহাবীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়।

যেসকল স্ত্রীছাহাবী কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত খানসা, সু'দা বিনতে কোরায়য (হযরত উছমান রা.-এর খালা), নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ ও অন্যান্য। বর্ণিত আছে যে,

হযরত খানসা (রা.)-এর

কবিতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করতেন, আর হাতে ইশারা করে বলতেন, হে খানসা, আরো কিছু শোনাও। (ইলইসাবা, ইবনে হাজার ৪/২৪৮৬-২৪৮৭)

নারীসমাজের ইলমচর্চার এ ধারা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিলো।

কারীমাহ আলমারওয়াযিয়্যাহ ছিলেন অনেক করেছেন। ইবনে আসাকির বলেন, ইমাম বুখারী যেসকল নারী মুহাদ্দিছ উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছাহ। বহু মুহাদ্দিছ পর্দার আড়াল থেকে তাঁর কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ তাঁর নারীশায়খ-এর সংখ্যা ছিলো আশির উপরে। ইমাম যাহাবী রহ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে যেখানে বহু পুরুষ বর্ণনাকারী মিথ্যাচারী বলে।

অভিযুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন দোষ-দুর্বলতার কারণে পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছেন সেখানে কোন নারীবর্ণনাকারী অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত সব্যস্ত হননি।

হানাফী ফিকহ-এর সুপসিদ্ধ কিতাব ‘বাদায়েউস সানায়ে’-এর রচয়িতা আল্লামা কাসানী রহ, এর স্ত্রী হলেন ফাতেমা। তিনি এত উচ্চস্তরের ফকীহা ছিলেন যে, তিনি, তাঁর পিতা আল্লামা সমরকন্দী ও স্বামী আল্লামা কাসানী, এই তিনজনের সম্মিলিত স্বাক্ষরে ফতোয়া জারি করা হতো।

এমনকি হিন্দুস্তানের ইতিহাসেও এর নমুনা রয়েছে। ভুপালের প্রসিদ্ধ আলিম মুফতি মাওলানা আব্দুল কাইউম (রহ.)-এর স্ত্রী ছিলেন

শাহ ওয়ালিউল্লহ দেহলবী (রহ.)-এর খান্দানের নারী। তিনি এত বড় আলিমা ছিলেন যে, কোন কঠিন মাসআলার সম্মুখীন হলে মুফতী আব্দুল কাইউম (রহ.) বলতেন

অপেক্ষা করো, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে বলছি।

সালাফ ও খালাফের এই ধারাকে পুনর্জীবিত করা এখন সময়ের দাবি।

ওলামায়ে কেরামের নিকট নিবেদন, তারা যেন নারীদের শিক্ষা ও তারবিয়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং উপযুক্ত ও আদর্শ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

জীবিকার দায় থেকে অব্যাহতি

মূল আলোচনায় ফিরে আসি। ইসলাম নারীসমাজের প্রতি অনেক বড় একটি ইহসান এই করেছে যে,

পরিবারের জীবিকা ও যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দান করেছে এবং তা পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছে।